প্রগতি

দেওয়াল পত্রিকা-   ২য় বর্ষ ডিজিটাল ভার্সান

অতিমারি বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা , ২০২১

ভূগোল বিভাগ

ধ্রুব চাঁদ হালদার কলেজ

দক্ষিন বারাশত   ,   দক্ষিন ২৪ পরগণা

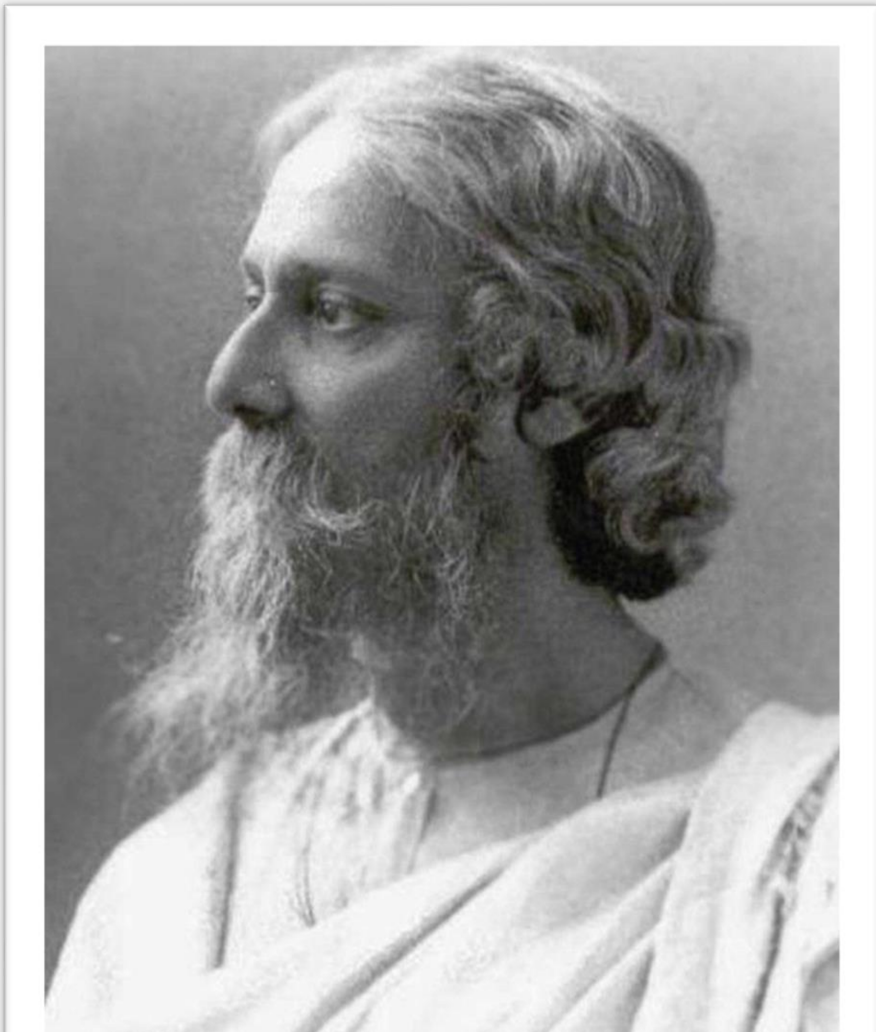

উৎসর্গ

অতিমারি আবহে যারা নিরন্তর যুদ্ধ করে যাচ্ছে বসুধা কে সুস্থ করার জন্য

শুভেচ্ছা বার্তা

কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ভূগোল বিভাগের বার্ষিক পত্রিকা 'প্রগতি'র বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত। ভাূগোল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা ভীষণ গর্ব অনুভব করি। আমি কামনা করি তাদের এই নবতর প্রয়াস সকলের সমাদর অর্জন করবে। মৌলিক ভাবনায় উদ্ভাসিত হয়ে এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নানামুখী লেখার মাধ্যমে নিজেদের মেলে ধরেছে এই পত্রিকায়। তাদের এই সৃজনশীল চিন্তা ও বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা এই বিভাগকে এক নতুন স্তরে পৌঁছে দেবার অন্যতম প্রচেষ্টা। করোনা-অতিমারী এবং বিধ্বংসী ঝড় আমাদের বারবার বিপন্ন করেছে। আমি বিশ্বাস করি তাদের পরিনত দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিকুলতা অতিক্রম করে দেশ ও জাতি গঠনে সম্ভবনাময় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

সুচারুভাবে বিন্যস্ত এই পত্রিকাটির প্রতিটি লেখা আমার ছাত্রছাত্রী দের শিল্পী মনের বলিষ্ঠতার দাবী রাখে। শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয়, বিভাগীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ও মুল্যবান অবদান রয়েছে এই প্রকাশনায়। এই সঙ্কট কালে পত্রিকা প্রকাশনার কাজটা সহজ ছিল না। বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষিকারা এই সময়ে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থেকে তাদের নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গী হয়েছেন। এই পত্রিকার প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।সবশেষে, যাদের লেখায় এবং যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই বিভাগীয় পত্রিকা 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে চলেছে তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ।

ডঃ সত্যব্রত সাহু

অধ্যক্ষ, ধ্রুব চাঁদ হালদার কলেজ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পত্রিকা সৃজন - মাননীয় অধ্যক্ষ ডঃ সত্যব্রত সাহু

বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা মণ্ডলী

বিভাগীয় ছাত্র ছাত্রী গণ

কভার পেজ - শিক্ষিকা মানসী ভূঞ্যা মাল

সূচীপত্র

1. রবীন্দ্র চিত্র – পূজারিণী ঘোষ
2. অন্তরতর – বর্ষা নস্কর
3. বোঝাপড়া – বিভাস হালদার
4. তুমি কি কেবলই ছবি - শিক্ষিকা মানসী ভূঞ্যা মাল
5. রবীন্দ্র রচনা সম্ভার- সৌরভ মিস্ত্রি
6. ছবি ও কবি ১- অদ্বিতীয়া কয়াল
7. ছবি ও কবি ২- লতিকা সরদার
8. বর্তমান পরিস্থিতি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রাসঙ্গিকতা- বুবাই নস্কর
9. প্রকৃতির প্রতিশোধ- গৌরাঙ্গ ভুঁইয়া
10. মা ও সন্তান- পৌলমী দাস
11. চলন্ত কলিকাতা- প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল
12. মহামারী ও রবীন্দ্রনাথ- রাজিয়া মণ্ডল
13. প্রথম আলোয় রবীন্দ্রনাথ- শিক্ষিকা পারুল দাস
14. সভ্যতার প্রতি- ঋত্বিকা মণ্ডল
15. দুই বিঘা জমি- সামিম হোসেন মীর
16. একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে- সোমনাথ মিস্ত্রি
17. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি ও প্রাসঙ্গিকতা- সৌমিত্র মন্ডল
18. বলাই- শুভাশিস দাস
19. আফ্রিকা- সুদীপ মণ্ডল
20. সভ্যতার প্রতি- সুমন মণ্ডল
21. ছবি ও কবি ৩- সহেলী ভাণ্ডারী
22. অতিমারি যখন রবীন্দ্র ভবনে- রসিদা মণ্ডল
23. রবির তিন কন্যা- শিক্ষিকা পূজারিণী ঘোষ
24. মুক্তি- দিব্যেন্দু সাহা
25. রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি-প্রসঙ্গ শিক্ষা – শিক্ষিকা ব্রততী দে

সম্পাদকীয়

অতিমারির দীর্ঘায়িত কাল। পরিবেশ পরিস্থিতির বাস্তব আঘাতে আমরা সবাই বিভিন্ন ভাবে বিপর্যস্ত । প্রগতির যাত্রা শুরু হয়েছিলো অতিমারির প্রথম বছরের আবহে। এবছর প্রকাশিত হতে চলেছে প্রগতির দ্বিতীয় বছরের প্রথম সংখ্যা । প্রতিবছর ধ্রুব চাঁদ হালদার কলেজের ভূগোল বিভাগ রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের । এ বছর পরিবেশ পরিস্থিতির আবহে সবার মন ই বিমর্ষ । বিভাগের সবাই সিদ্ধান্ত নেয় একটু অন্য ভাবে রবীন্দ্রনাথ কে ফিরে দেখা র প্রচেষ্টা নেওয়া হোক। ওনার ই প্রজ্ঞা এবং সৃজনশীল কাজ গুলি কে দেখা, যদি বর্তমান আবহের মিল খুঁজে পাওয়া যায় । ব্যাক্তি রবীন্দ্রনাথ বারে বারে আঘাত পেয়েছেন বিমর্ষ হয়েছেন, তাঁর সমসাময়িক কালে বিশ্ব নিন্দিত হয়েছে মানবতার অপমানে। দেশের পরাধীনতা, মানুষের শোষণ সমস্ত কিছুর আঘাত উনি ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের সৃজনশীলতায় । এত বিমর্ষতা য় উনি ভেঙ্গে পরেন নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের যে অভিমুখ সেখানে বারে বারে অন্বিত হয়েছে উঠে দাঁড়াবার আহ্বান। বিশ্ব-প্রকৃতি-মানবতা র জয়গানে মেলে ধরেছেন তাঁর প্রজ্ঞা কে। এই সময়ে এমন বিশ্বে আমরা আমাদের জীবনকাল অতিবাহিত করছি যেখানে বিশ্ব-প্রকৃতি-মানবতা বিপর্যস্ত বিভিন্নভাবে । যদি আমাদের এই ফিরে দেখার পাঠে নতুন ভাবে উঠে আসে জীবনের কিছু উপলব্ধি সেটাই হবে পরম প্রাপ্তি। বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রকাশিত হতে চলেছে রবীন্দ্র বিশেষ সংখ্যা । অতিমারির আবহে সবাই সুস্থ থাকুন।

ভূগোল পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ

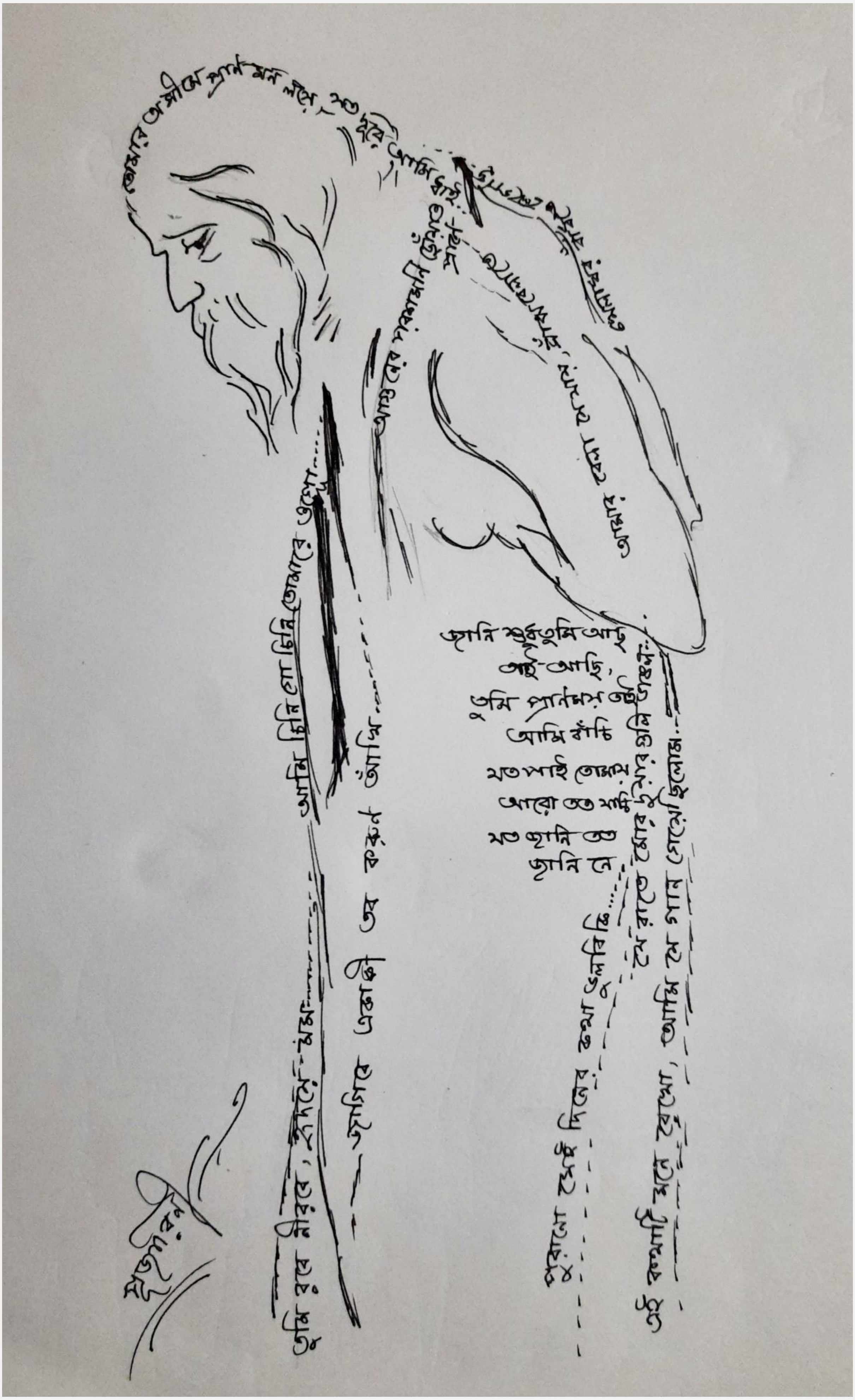

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই...
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
আমার বেলা যে যায়, সাঁঝবেলাতে
খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি
আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো...
তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম
জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি...
জানি শুধু তুমি আছ
তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই
আমি বাঁচি
যত পাই তোমায়
আরো তত যাচি
যত জানি তত
জানি নে
পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি...
যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়...
এই কথাটি মনে রেখো, আমি যে গান গেয়েছিলেম...

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী চিন্তাধারায় ফুটে উঠেছে বাস্তব এবং কল্পনার মিশেলের অনন্য পথ । ওনার বহুধা পথের অনুভুতি কে কেন্দ্র করে এই কবিতা টি লেখা ।

অন্তরতর

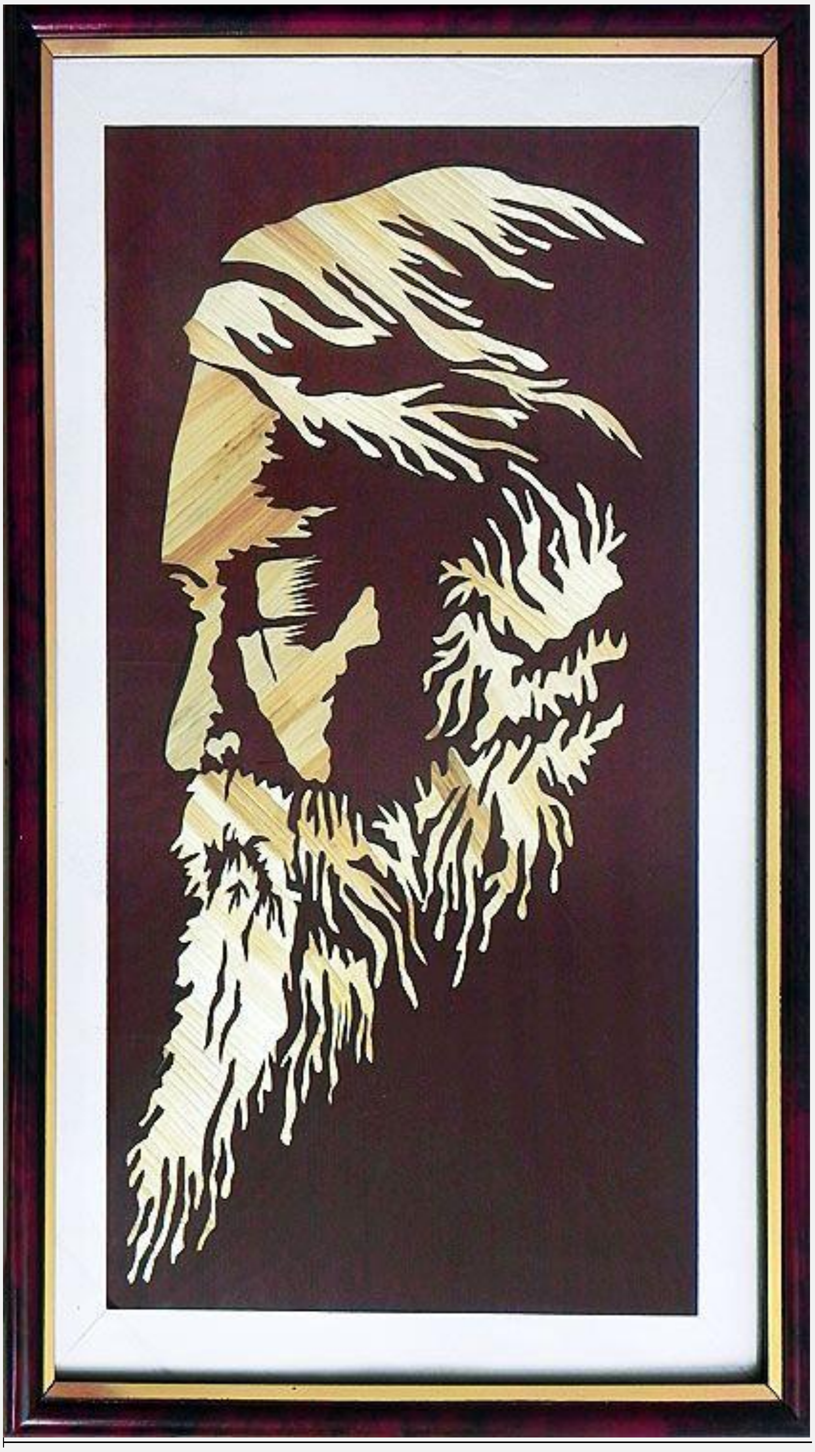

কুঞ্চিত মোর হৃদয় পদ্ম

ভোরের আলোতে নাহি ফোটে,

সূর্যের আলো পরেনা তাতে

প্রভাতে আঁধার ঢাকে।

কেটে গেছে অনেক রাত

আসছে নতুন সকাল এক,

এবার মোরে জাগ্রত করো

তুমি অন্তরতর হে।

শান্তি বিহীন ভুবন মাঝে

উজ্জ্বল করো তুমি মোরে,

ক্লেদাক্ত জাতির বুকে

চির সুন্দর করো হে।

জীর্ণ হেথা প্রেম সম

তাই মোর বিকশিত করো,

চির নন্দিত করো হে

তব নির্মল চরণ পদ্মে।

সংশয় ভরা হৃদয় মাঝে

অন্তর কাঁদিয়া ওঠে,

মোর জাগ্রত করো, উদ্যত করো

তুমি অন্তরতর হে।

বর্ষা নস্কর (সেমিস্টার , ২য়)

বোঝাপড়া

''মনেরে আজ কহ যে

ভালো মন্দ যাহাই আসুক

সত্যেরে লও সহজে"।

"বোঝাপড়া" কবিতাটি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ক্ষনিকা" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯০০ খিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।আমাদের জীবন সুখ ও দুঃক্ষের সমন্বয়ে গড়া। জীবনে যেমন সুখ ও আনন্দ রয়েছে,তেমনি দুঃখ ও বেদনা রয়েছে। জীবনের এই কঠিন সত্যকে মেনে নিয়ে চলতে হবে। আমাদের এই সমাজে বহু ধরনের মানুষ বসবাস করে। কেউ আমাদেরকে ভালোবাসে, কেউবা ঘৃণা করে। আবার কেউ হয়তো আমাদের দ্বারা অপমানিত বা প্রতারিত হয়, আমরা আবার কারোর দ্বারা অপমানিত বা লাঞ্ছিত হই। আমাদের চলার পথে অনেক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রনা আসে, এবং এগুলোকে জীবনের একটা অঙ্গ হিসেবে মেনে নিয়ে চলার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। সবশেষে বলতে পারি, আমাদের জীবনে ভালো, মন্দ, সুখ, দুঃখ, মিলন, বিচ্ছেদ সব কিছু কে চিরন্তন সত্য হিসেবে মেনে নিয়ে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলার ইঙ্গিত এই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে।

বিভাস হালদার (সেমিস্টার , ২য়)

তুমি কি কেবলই ছবি !

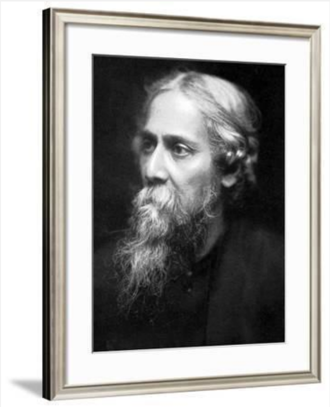

"এসো হে বৈশাখ এসো এসো " |এমন আহ্বাণ সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালি বছর বছর করিয়া আসিলেও এবার মর্তবাসী যেন ঈশ্বর সাধনার মত বৈশাখের পরিবর্তে রবি ঠাকুরকেই প্রাণপণে স্মরণ করিতেছে| প্রকৃতি শিশুসুলভ খেলিতে খেলিতে , কাঁচের ফুলদানির মত পৃথিবী কে , চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে COVID-19 নামক অতিমারির আঘাতে| এখন জুড়িবার লোক নাই , টুকরোগুলি ফেলি বার ও লোক নাই |দুই বৎসর ধরিয়া অতি মারির যে প্রকোপ চলিতেছে ,তাহাতে সমাজ –অর্থনীতি- স্বাস্থ্যব্যবস্থা -শিক্ষা ব্যবস্থা -অন্ন –বস্ত্র- বাসস্থান , একে একে হারাইয়া এখন জীবন তরী বুঝি ভরাডুবি হইয়া যায় , সেই আতঙ্কে কাঁপিতেছে গোটা বিশ্ব | মনোবল বৃদ্ধি করিয়া , দেহ-মনে অনাক্রম্যতা অর্জনের নিমিত্ত কাহাকে আদর্শরূপে পাইবে , তাহা হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে সকলে|

এমন শিক্ষা প্রকৃতি যে নতুনভাবে প্রদান করিল তাহা নহে , ইতোপূর্বে ওলাউঠা- গুটি বসন্ত- ম্যালেরিয়া- প্লেগ -দুর্ভিক্ষ , অসহায় করিয়াছিল গোটা পৃথিবীকে , তবে সে যাত্রায় কবিগুরু স্বয়ং সপরিবার বন্ধুবান্ধব লইয়া রাস্তায় নামিয়া ছিলেন| কবিতা -নাট্য রচনা -গান বাঁধিয়া -অর্থসাহায্য করিয়া- হাসপাতাল গড়িয়া -এমনকি নিজ হাতে 'পঞ্চ তিক্ত' পাচন প্রস্তুত করিয়া -প্রতিষেধক গ্রহণে সকলকে উদ্যোগী করিয়া , যে সেবা প্রদান করিয়া ছিলেন , তাহাতে দেহ মনে বল লাভ করিয়া শত শত প্রাণ ফিরিয়া পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল অনেকের | কিন্তু এখন চারিধারে ভাইরাসের মোড়ক লাগিয়া বিশ্ব গোটা শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইতেছে| চিকিৎসা র সরঞ্জাম নাই-ঔষধ পত্র নাই- সেবা করিবার লোক নাই , অব্যবস্থা অনাদরে ফুটপাথে অসহায় কত শত প্রাণ অকালে ঝরিতেছে , এর শেষ কোথায় কে জানে ?

আজ রবি ঠাকুর নাই , সশরীরে অবতীর্ণ হইয়া পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করিবেন , এমন ভাবনা কল্পনা মাত্র| তবে যাহারা কবিগুরুর জীবন আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যথাসাধ্য করিতেছেন , যাহারা কিঞ্চিৎ মাত্র করিবার চেষ্টা করিতেছেন বা যাহারা মনেমনে ভাবিয়া প্রস্তুত হইতেছেন , সকল বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে তাহাদের মত রবি ঠাকুরদের প্রতি এবছরের রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী র সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি|

মানসী ভূঞ্যা মাল

শিক্ষিকা, ভূগোল বিভাগ

রবীন্দ্র-রচনা সম্ভার

সমগ্র রবীন্দ্র জীবনের জীবন দর্শনের অসামান্য প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর 'শেষ লেখা' কাব্যগ্রন্থের ১১ সংখ্যক কবিতা 'রূপনারানের কূলে' কবিতাটিতে। কবিতাটিতে কবি বাস্তবে একটি মানুষের জীবনের অন্তিম পর্যায় এলে মানুষের কী কী বিষয় উপলব্ধি হয়, কোন্ কোন্ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয় তা দেখিয়েছিলেন।

মানুষ যখন তাঁর জীবনের অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তিনি বুঝতে পারেন, যে জগতে সে বাস করছে তা প্রকৃতপক্ষে কোনো স্বপ্ন ছিল না। প্রতিটি মানুষ তাঁর নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সমাজের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটা দিন যুদ্ধ করে চলেছে। সমাজের কিছু উচ্চবিত্ত মানুষের জন্য নিম্নবিত্ত মানুষদের অস্তিত্ব আজ বিপন্নতার স্বীকার। এই দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যে দিয়ে প্রতিটা নিম্নবিত্ত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত মানুষ কঠিন সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। তারা দৈনিক পরিশ্রম করে যে অর্থ উপার্জন করে স্বার্থান্বেষী সমাজের বিরুদ্ধে এ যেন টিকে থাকার এক তীব্র প্রতিবাদ । রবীন্দ্রনাথ বারে বারে তার এই সব লেখায় এই প্রান্তিক মানুষদের জয়গান কয়েছেন ।

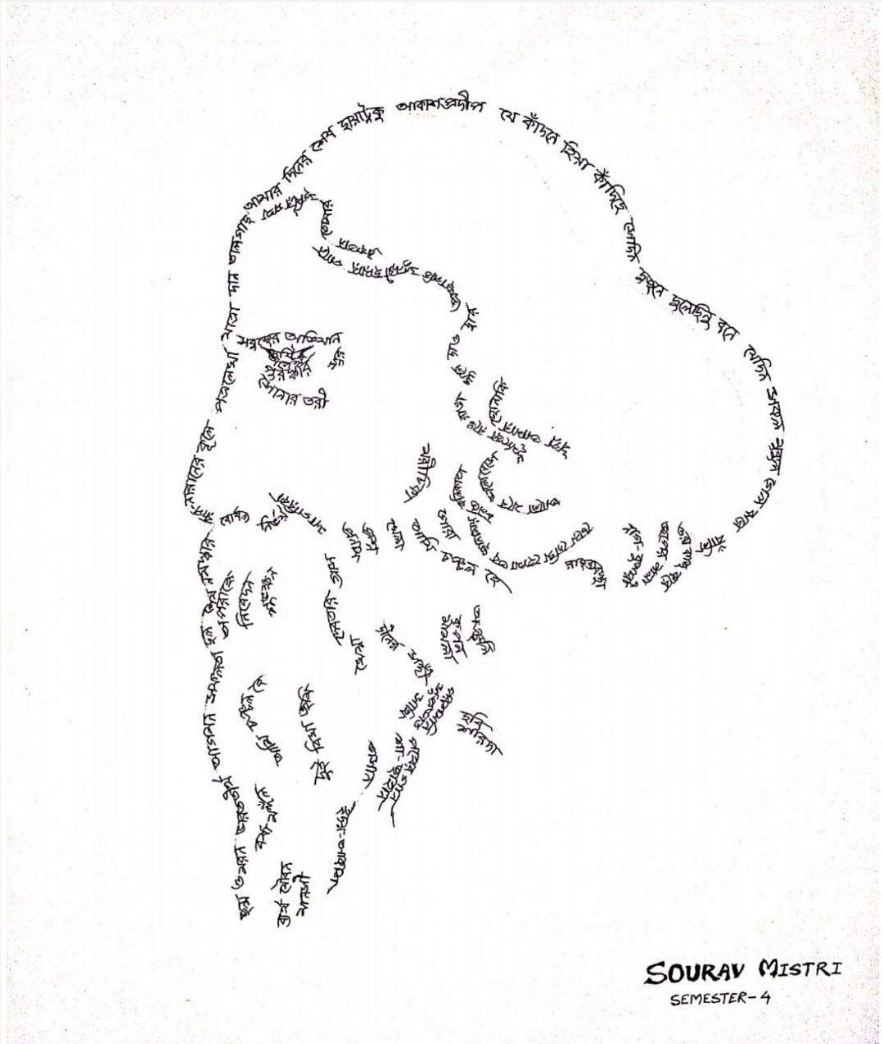

ছবি ও কবি ১

প্রদত্ত চিত্রটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি চিত্র, এটি একটি নাচের মেয়ের একটি শিরোনামহীন স্কেচ। তিনি এই মেয়েটির নৃত্যের তাল, ছন্দ ও সুরকে বোঝাতে চেয়েছেন, এর সাথে সাথে তিনি মেয়েটির আঙ্গিক ভাব বা শৈলী কে বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন, এবং এর সাথে প্রকৃতির তাল, ছন্দ, সুর ও ধরন কে বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। দীর্ঘ প্রবাহমান চুলের চলাফেরা চিত্রিত করে সুন্দর চিত্রকর্ম টি সমাজের সামনে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । নারী ও প্রকৃতি কে এখানে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির রুপ, রস, গন্ধ এবং উদ্দামতা র সাথে মিলে গেছে নারীর প্রকাশ ।

অদ্বিতীয়া কয়াল (সেমিস্টার , ২য়)

ছবি ও কবি ২

অবসাদে-একাকী এ অনন্ত নগরে
বিজনে লুকায়ে আঁখি,
আশা তব খুঁজিবারে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলি ও কলমের পরিবেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর স্মৃতিচারণে তাঁকে এই অর্ঘ্য দ্বারা প্রণিপাত করলাম।

লতিকা সরদার, (সেমিস্টার, ২য়)

বর্তমান পরিস্থিতি- রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমানে মানুষ বিভেদহীন সমাজের দাবিতে সোচ্চার হলেও , মানুষ ভোলেনি মানুষকে ছোট করতে । অসম্মান ,অত্যাচার কিছু মানুষের নিত্যসময়ের সঙ্গী ! এখানে কবির সৃষ্টি একাধিক 'মানুষের মুখ ' - বার্তা দিয়ে যায় ' মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা - সম্প্রীতির ।বর্তমানে সন্তান সাবলীল হলে মায়ের ঠিকানা হয় ' বৃদ্ধাশ্রম ' ! যেখানে কবির আঁকা " মা ও সন্তানের" ছবিতে মা ও সন্তানের অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা বলে ! চেনা জানা জগতের চেনা জানা প্রাণীগুলি আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে বিলুপ্ত , যা প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের চোখে আনে জল। তার থেকে কবির আঁকা অচেনা অজানা জগতের নামহীন প্রাণীগুলো যাদের হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই তারা কিছুটা মুখ দিয়ে যায় । নানা দিক থেকে রবী ঠাকুরের চিত্রগুলি আজ যেন মিলে যায় - ' বর্তমান সমাজের সাথে , বর্তমান বাস্তবতার সাথে ।

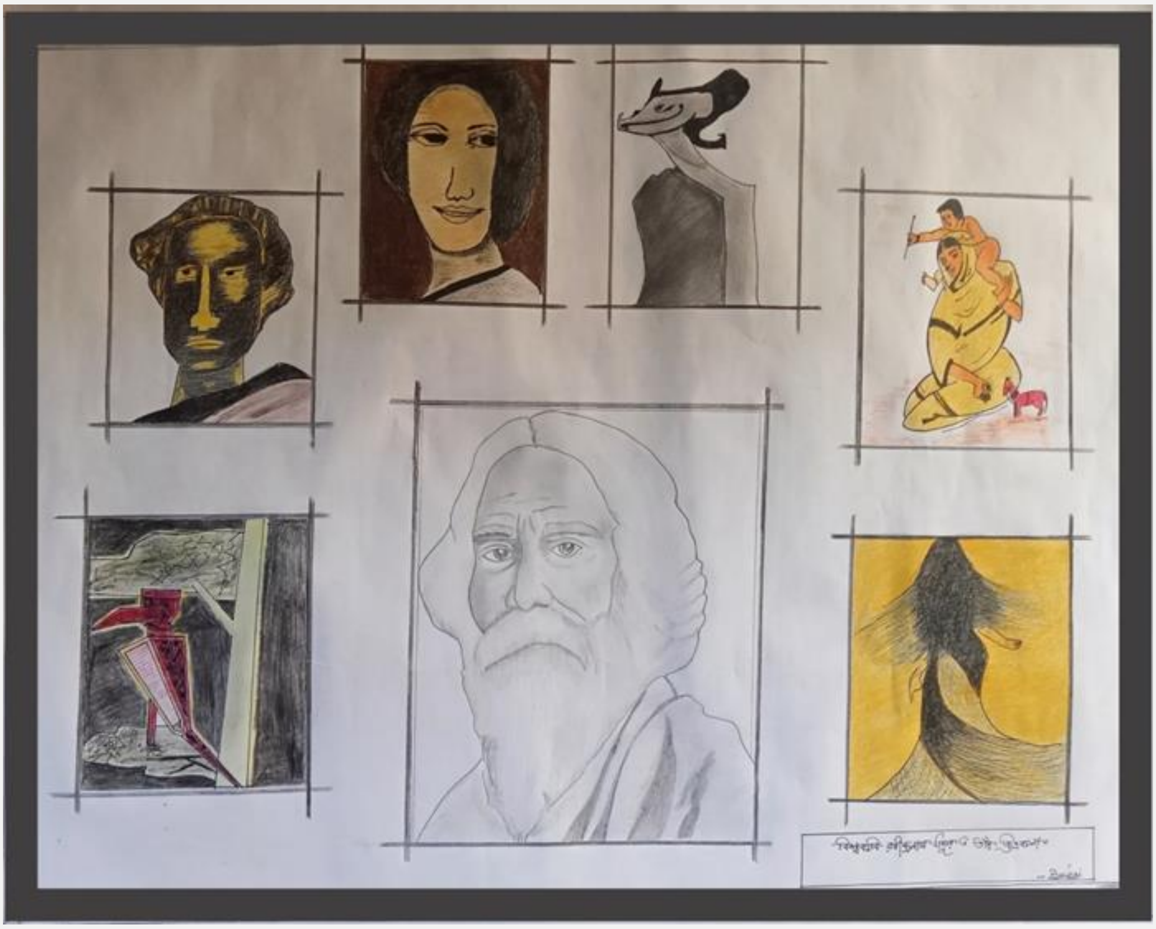

নাম - বুবাই নস্কর (সেমিস্টার, ২য়)

<u>প্রকৃতির প্রতিশোধ</u>

নাটকের বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা:- এই নাটকটি প্রথম ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।এর সম্পর্কে বাস্তবের কিছু বহিঃ প্রকাশ কবিতার মাধ্যমে আলোচনা করা হলো।

আমার কোলে জন্ম লইয়া ,

আমায় করলি আঘাত।

কুঁড়েঘরে জীবন ছাড়তে,

আমারে করলি সাফ।

বনজঙ্গলে কুঁড়েতে বুঝি,

মন টেকে না আর।

কলকারখানা গড়তে শিখে,

আমায় করলি পর।

তাইতো আমার বুক ফেটেছে,

মেনেছি অত্যাচার।

নিজের আঘাত নিজেই সারাই ,

কিছুই চাইনা আমি।

এরপর ও যদি বুঝতে না পারিস

ভুলব, তুই ছিলি আমার সন্তান।

গৌরাঙ্গ ভুঁইয়া (সেমিস্টার , ৪)

মা ও সন্তান

ভারতীয় শিল্প - সাহিত্য সংস্কৃতির পুরোধা ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।নবীন বয়সে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্য তাঁকে সাধারণ ড্রয়িং বা স্কেচ এ অনুপ্রাণিত করে। তাঁর এই রৈখিক চিত্র অনুশীলন ক্রমে ছোট ছোট কাজের দৌলতে বরনিল ও চিত্রময় হয়ে ওঠে। নারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম বিষয় ছিল। সেরকমই 'মা ও ছেলে' ছবিতে দেখা যায় , একজন মধ্যবয়সি মা তার শিশু ছেলেকে কোলে নিয়ে আসীন। হালকা বাদামি শাড়ি পরিহিত মা'র কোলে পরিধেয় শিশুর অবস্থান আর মায়ের দৃষ্টি যেন দারিদ্রের প্রকাশ। তিনি অনুজ্জ্বল রঙের মুন্সিয়ানার ব্যবহার করেছেন। গাঢ় কালো , বাদামি লাল আর হলুদাভ রঙের তার ক্যানভাস হয়ে উঠেছে মূর্ত। রঙের ব্যবহারে ছবিতে কখনো বিষাদ,ব্যঙ্গ, আদিমতা আর রহস্যময়তার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলোতে নেই রঙের প্রচন্ডতা।এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ অঙ্কন করেছেন তবে তাঁর ছবিতে প্রাণময়তা খুব আনেননি বরং হয়েছে বিষন্নতার প্রতিমূর্তি।

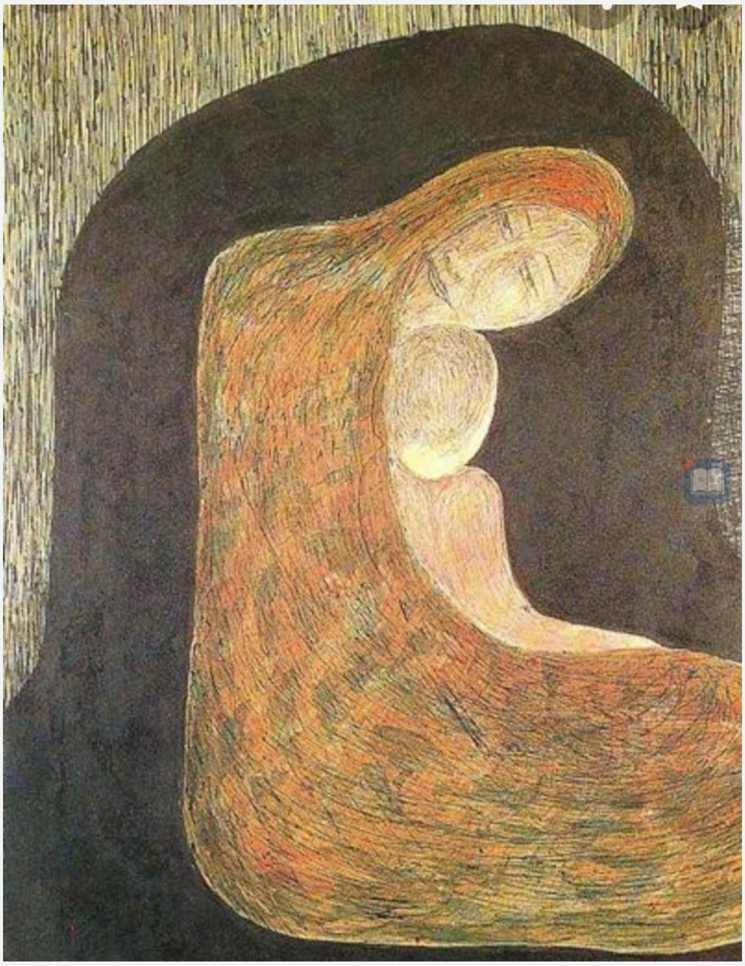

পৌলমী দাস, (সেমিস্টার, ২য়)

চলন্ত কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ 'চলন্ত কলিকাতা' কবিতাটি লেখেন বাংলার ১৩৩৬ সালে । শহর জীবনের যান্ত্রিকতা জীবন তার যে রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেই ছবি এখনো গুরুত্বপূর্ণ । তাকে কেন্দ্র করেই নিচের কবিতা টি লেখা ।

ইঁটের খাঁচায় বন্দি মানুষ শহর কলিকাতা।

শীত,গ্রীষ্ম,বর্ষা , দেয়না তাদের নাড়া।

ফাল্‌গুনেতে বসন্তের রঙ দেয় না তাদের দোলা।

বৈশাখেতে ঝড় বাদলে ভিত রয় তারা খাড়া।
শীতের বাতাস দেয় না কাঁপন থামগুলোতে।
কবির চোখে পড়ল ধরা আজব কলিকাতা॥
ইঁটের শরীর নিয়ে বেড়ায় ঘরে কলকাতাটা।
চীনের মতো পাঁচিল ঘেরা, উঁকি মারে উঁচু নীচু ছিদগুলো সব।
আকাশটাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরছে শহর কলিকাতা।
অলিগলি রাস্তাগুলো ময়েল সাপের দল,
ট্র্যামগাড়ি তার পিঠে করছে টলোমলো॥
ফুটপাতেতে বসেছে হরেক রকম দোকান,
করছে সেথায় জটলা সারি সারি মানুষ।
কতরকম দেখার জিনিস রয়েছে শহর কলিকাতা।
মনুমেন্টের লেগেছে হিড়িক দেখতে যাবো সবাই।
ইস্কুলেতে ছেলেরা সব করছে হুড়ো হুড়ি।
অঙ্কের বই নৃত্য করে , ইংরাজী বই দিচ্ছে লুটোপুটি।
বাংলা বইয়ের পাতা ছিঁড়ে করছে সবাই প্লেন।
ঘন্টাগুলো দুলে দুলে বাজছে ঢং ঢং।
সময়গুলো যাচ্ছে চলে ছুটছে মানুষ কাজের তরে।
রান্নাঘরে রাঁধুনিরা রকম রকম করছে মেনু,
খাচ্ছে মানুষ আয়েশ করে ,
মরছে তাই দলে দলে।
ভাঙছে আজ সাধের প্রাসাদ ,
উঠছে তাই লাশের পাহাড়।
প্রকৃতি তাই ভাবছে আজ !
দন্ড তোদের দিচ্ছে কে?

বিলাসিতার প্রাচীর তুলে, করল মানুষ অনেক দূরে।

লাশের পর যাচ্ছে লাশ জ্বলছে শহর কলিকাতা।

চিন্তার পাহাড় বুনছে মানুষ,

ঘুম হয়না তাদের চোখে।

বিষন্নতায় ভাবছে কবি ,

লিখছে তাই দুঃখের ছবি।

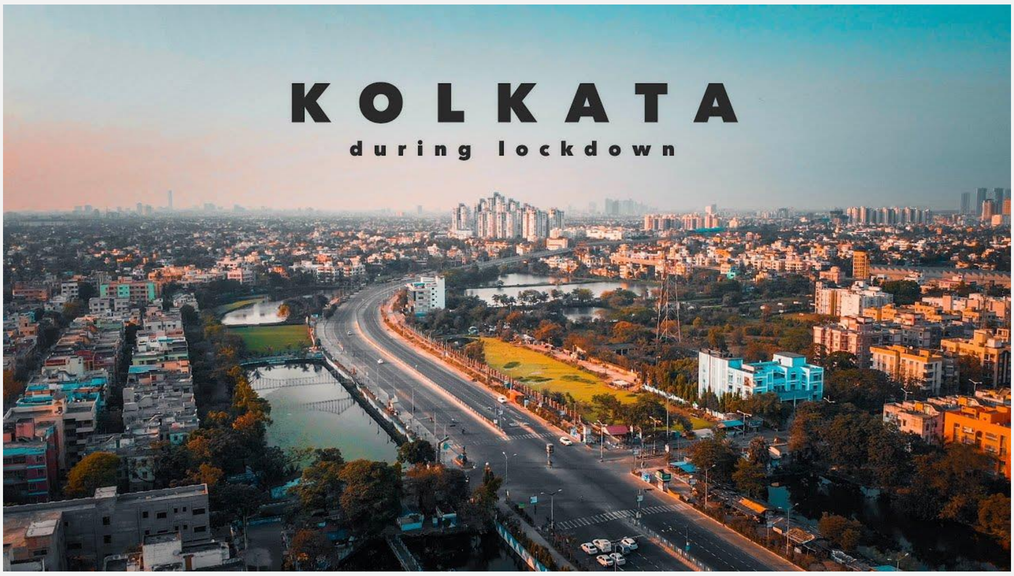

প্রিয়াঙ্কা মন্ডল (সেমিস্টার - ২য়)

<u>মহামারী ও রবীন্দ্রনাথ</u>

বর্তমান দিনে যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা সকলে চলেছি জীবন হয়ে উটেছে দুর্বিসহ। প্রচণ্ড অবসাদ আর একঘেয়েমি হয়ে উঠেছে সকলের নিত্য দিনের সঙ্গী। এই পরিস্থিতিতে জীবনের স্বাদ ফিরে পাওয়ার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন স্বয়ং বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীর্ঘ জীবনে তিনি স্বজন প্রিয়জনদের মৃত্যু তে জর্জরিত । কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও তিনি মানুষ কে দেখিয়ে গেছেন জীবনে বাঁচার স্বপ্ন।

১৯১১ সালের প্লেগ রোগের দাবানল যখন একের পর এক স্বজন প্রিয়জন দের গ্রাস করে চলেছে তখন কবি লিখলেন, '...ম্যালেরিয়া-প্লেগ-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষ্য মাত্র, তাহারা বাহ্য লক্ষণমাত্র–মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা এতদিন একভাবে চলিয়া আসিতেছিলাম আমাদের হাটে বাটে গ্রামে পল্লীতে আমরা একভাবে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আমাদের সে ব্যবস্থা বহুকালের পুরাতন। তাহার পরে বাহিরের সংঘাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। এই নতুন অবস্থার সহিত এখনো আমরা সম্পূর্ণ আপস করিয়া লইতে পারি নাই; এক জায়গায় মিলাইয়া লইতে গিয়া আর এক জায়গায় অঘটন ঘটিতেছে। যদি এই নতুনের সহিত আমরা কোনোদিন সামঞ্জস্য করিয়া লইতে না পারি তবে আমাদিগকে মরিতেই হইবে।'

বিশেষত এই লেখাটি বর্তমান দিনে প্রসঙ্গত হয়ে উঠেছে । ২০২০-২০২১ করোনা বিপর্যয় আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে। মানুষ সামাজিক জীব। সংঘবদ্ধতাই মানুষের ধর্ম। অথচ সামাজিক দূরত্ব তথা বিচ্ছিন্নতাই এ সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিজের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, সর্বোপরি এই পৃথিবীর স্বার্থে এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্যবিধান করতেই হবে। নিজে সহ চারপাশের মানুষ জনদের মধ্যে সচেতনতার বাণী ছড়িয়ে দিতে হবে যতটা পারা যায় । ভয় কে জয় করতে হবে ,আশা রাখতে হবে সংকট মুক্ত এক নতুন দিনের । অতএব আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ এর সেই সাবধানতার বাণী বর্তমান সময়ে সর্বসম্মত ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উটেছে ।।

রাজিয়া মন্ডল (সেমিষ্টার, ৪)

"প্রথম আলো'য় রবীন্দ্রনাথ"

"আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে;

পর পারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে;

দিবস ফুরাৰে যবে সে দেশে যাইতে হবে,

এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী...,"

____*(পাতা :'**ভগ্নহৃদয়**'_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালিদের আত্মার সঙ্গে মিশে আছেন। মানব জীবনের সত্যিই এরকম কোনও অনুভূতি বোধহয় নেই, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জড়িয়ে নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বাঙালির চর্চার শেষ নেই, বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে আবিষ্কৃত হয়েছেন তিনি ঠিক তেমনি 'প্রথম আলো'য় বাঙালির মনে প্রাণে রবীন্দ্রনাথ নতুন ভাবে জায়গা করে নিয়েছেন। 'প্রথম আলো' উপন্যাসটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একটি বিশাল বর্ণাঢ্য বেগবান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অনবদ্য উপন্যাস - এই উপন্যাস বাঙালির প্রাণের উপন্যাস। এই উপন্যাসে আছেন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জগদীশ চন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ,অর্ধেন্দু মুস্তাফির মতো খ্যাতনামা সব ঐতিহাসিক চরিত্র; যদিও উপন্যাসের মূল নায়ক হল- 'সময়', যা আঠারোশো তিরাশি থেকে উনিশশো সাত পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই উপন্যাসে মূল কাহিনীর সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক কোনো এক সুতোয় বাঁধা রয়েছে।উপন্যাসের এক বিশেষ অংশ জুড়ে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য জীবন, ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের নানান ঘটনা।

'প্রথম আলো' উপন্যাস এর কাহিনী শুরু হয় এক রাজঅন্তঃপুরে, রাজার নাম বীরচন্দ্র মানিক্য, রাজ্যের নাম ত্রিপুরা। পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কাহিনী ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী বাংলায়, তারপর সমগ্র ভারতে। কাহিনীর শুরুতে দেখা যায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রজারা চলেছে রাজধানীর উদ্দ্যেশে, রাজসভায় বিজয়া দশমীর ভোজে প্রজারা সবাই নিমন্ত্রিত। তারপর উপন্যাসের অনেকটা জুড়েই ত্রিপুরা রাজ্যের গল্পগাঁথা চলে, রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে রাণীদের কুটিলতা, হিংসা, বিদ্বেষের কাহিনী, সিংহাসন নিয়ে গোপন রাজনীতি, স্বাধীন এরাজ্যে ইংরেজদের হস্তক্ষেপের চেষ্টা সবকিছুই যেন এক রূপকথার রাজ্যে নিয়ে চলে যায় পাঠকদের।

উপন্যাসের অন্যপ্রান্তে চোখ রাখলে দেখা যায় রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজসভায় যখন বিজয়া দশমীর ভোজ চলছিল তখন গঙ্গা তীরে বসে একজন নবীন কবি তাঁর কাব্য রচনা করছিলেন। এই সময় কালে প্রকাশিত তার 'ভগ্নহৃদয়'কাব্য গ্রন্থটি একসময় পৌঁছে গিয়েছিল ত্রিপুরায়। পাটরানী ভানুমতী তখন সদ্যমৃত,বীরচন্দ্র ওই কবিতাগুলি পাঠ করে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন এবং দূত মারফত শিরোপা পাঠিয়েছিলেন কবিকে। একজন নবীন কবির পক্ষে এই রাজস্বীকৃতি পাওয়া খুবই বিরল ঘটনা এবং এই ঘটনাটি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এই কবি আর কেউ নন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই ঘটনার অনেক পরে পরবর্তী সময়ে যখন বীরচন্দ্র মানিক্য কলকাতায় কিছুদিন বসবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। সেই সময় বীরচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জানা যায়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সাথে ত্রিপুরার মহারাজাদের সম্পর্ক দীর্ঘকালের, সেই যোগসূত্রকে স্থায়ী সুখ-দুঃখের সম্পর্কে নিবিড় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভিত্তিমূলে ছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ত্রিপুরার মহারাজাদের অকৃত্রিম ভালবাসা। বঙ্গেও যখন বাংলা ভাষার সরকারি মর্যাদা নেই, ত্রিপুরায় রাজভাষা তখনও বাংলা! ভাবা যায়? রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় ,"যে অপরিণত বয়স্ক কবির খ্যাতি পথ সম্পূর্ণ সংশয়সঙ্কুলছিল, তার সঙ্গে কোন রাজত্ব গৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহেতুক সখ্য-সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।"

ত্রিপুরার মহারাজাদের হাতে বাঙালির ভাষা সংস্কৃতি, বিজ্ঞান যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে, ভাবলেই বিস্ময় লাগে। রবীন্দ্রনাথের বন্ধুজন জগদীশচন্দ্র বসু বিলেতে গিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা করবেন, তার অর্থ চাই প্রচুর, ত্রিপুরার রাজা সেই অর্থ সাহায্য করলেন, বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী স্থাপনেও মুক্ত হস্তে দান করেন এই মহারাজারা। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন ত্রিপুরাকে। মনে করা যায় মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য থেকেই আধুনিক ইতিহাসের সূচনা।

ত্রিপুরার রাজধানী 'আগরতলা'শহরটি কে ১৯০৯ সালের পর থেকে বিপ্লবী দল গুলি আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই সবকিছুর একটাই কারণ ছিল ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান এবং রাজাদের সমর্থন। জানা যায় রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে এখানে রাখি বন্ধন উৎসবও পালন করা হয়ে থাকে তৎকালীন সময়ে।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সাথে ত্রিপুরার রাজবংশের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যের সময়কাল হতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ছিল ।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের কবি হয়ে উঠার পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তার বড় ভাইয়ের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর ভূমিকা। । তিনিই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্যলক্ষ্মী, তার কবি হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা। তাদের দু'জনের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত এবং কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার ঘটনা 'প্রথম আলো উপন্যাসে' গল্পচ্ছলে অসাধারণ নাটকীয়তায় ফুটে উঠেছে। মৃত্যুর পরও রবীন্দ্রনাথের কাব্যচেতনায় ছায়া হয়ে ছিলেন কাদম্বরী, ছায়া হয়ে ছিলেন প্রথম আলো উপন্যাস জুড়েও।

উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বিয়ের কাহিনী, স্ত্রী মৃণালিনীর সাথে তার সম্পর্ককের স্বরূপ। পরিপূর্ণ কবি হয়ে ওঠার পাশাপাশি একজন প্রেমিক, একজন স্বামী, একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ, সর্বোপরি একজন সমাজসেবক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নানামুখী চরিত্র উপন্যাসটিতে নিখুঁতভাবে অঙ্কিত

হয়েছে; অঙ্কিত হয়েছে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পেছনে কবির শ্রম, ভালোবাসা আর ত্যাগের গল্প। ফুটে উঠেছে সেখানে একজন কবির 'গুরুদেব' হয়ে উঠার প্রেক্ষাপট।

ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুর থেকে শুরু হয়ে এই উপন্যাসের সময় আবর্তিত হয়ে চলেছে বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সূচনা মধ্য দিয়ে। এই কাহিনী বাঙালির কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষামূলক একটি কাহিনী। এ কাহিনী যেন বাঙালির একাল - সেকালের কাহিনী, জীবনীশক্তি ও নবজাগরণের কাহিনী। ইতিহাস-ভূগোল-ঐতিহ্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-চেতনা-প্রেম-বিচ্ছেদ-আবেগ-কল্পনা সবকিছুকে স্পর্শ করে থাকা এই কাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথও মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছেন । যদিও এই উপন্যাসের সার্থকতা বিচার করা এই রচনাটির উদ্দেশ্য নয়, উপন্যাসটিতে ত্রিপুরার

রাজকাহিনী ও ঘটনাবলির সঙ্গে বিশ্বকবি কিভাবে নতুনরূপে নতুনভাবে বাঙালির মনে জায়গা করে করে নিয়েছেন - তা দেখানোই ছিল এই রচনার মূল উদ্যেশ্য ।

পারুল দাস, শিক্ষিকা, ভূগোল বিভাগ

ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাথ; Image source: Tripura State Tourism

সভ্যতার প্রতি

বাংলার তথা সমগ্র ভারতের অন্যতম প্রথিকৃত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর অজস্র গুন এবং চিন্তাভাবনার জন্য বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন একাধারে একজন লেখক, গীতিকার, সাহিত্যিক, সুরকার, নাট্যকার, চিত্রকর, দার্শনিক এবং বিশ্ব কবি হিসাবে। ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ভিন্ন রূপ। ভারতের মানুষের প্রতি, বাংলার মাটির প্রতি তাঁর ছিল অফুরন্ত ভালোবাসা। বাংলার গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তাঁর ছিল অন্তরের সম্পর্ক। তিনি তাঁর অনেক লেখার মধ্য দিয়ে বঙ্গমাতার সৌন্দর্য্য তার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষের কাছে।

যুগের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তন হয়েছে সভ্যতার, যার কারণে বাংলার কবির স্বপ্নের 'সহজ পাঠের ' গ্রাম হলো শহর। কবির কল্পনার মায়াবী অরণ্য কেটে স্থাপিত হলো বড় বড় শিল্প ক্ষেত্র ও ইমারত। সেখানে আর সাদা মেঘের ভেলা ভাসে না, ভাসে কলকারখানা র কালো ধুয়া। মানুষের নগরায়নের প্রবল লালসা আঘাত দিল কবির বাংলার গ্রাম কে। ব্যাথিত বঙ্গভূমির সেই সন্তান ' সভ্যতার প্রতি' আকুল আবেদন করেন -' দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য , লাও এ নগর।' কিন্তু সভ্যতার নগরায়নের নেশায় মেতে থাকা মানুষ কবির সেই আর্তনাদ শুনতে পায়নি।

আজ আমাদের দেশে প্রায় সমস্ত মানুষ গৃহ বন্ধি। সমস্ত দেশ আজ করোনা অতিমারি র কবলে। আজ কোনো মানুষ পারেনা মন খুলে প্রশ্বাস নিতে। সবাই এর মুখ বন্ধ আবরণে। প্রতিদিন সহস্র মানুষ মৃত্যু বরণ করছে । এ ই পরিস্থিতির জন্য শুধু ক্ষুদ্র ভাইরাস দায়ী নয়। দায়ী নগরায়নে মত্ত মানব সমাজ ও। আজ মহামূল্য অক্সিজেন এর ঘাটতি মনে করিয়ে দিচ্ছে কবির সেদিনের পার্থনা কে। কবি তাঁর 'শেষ লেখা' কাব্য গ্রন্থের ১১ সংখ্যক কবিতায় নিজের শেষ জীবনের মৃত্যুর বাস্তব অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলেছেন - ' রূপ নারানের কূলে আমি জেগে উঠেছিলাম' । আজ হয়তো আমাদের দেশ ও সেই রুপনারণের কূলে উপনীত হয়েছে।

বাংলার রবি ঠাকুর হলেন সৃজশীলতার কবি। কবি তার সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের কে শিখিয়ে গিয়েছেন বিপদে লড়াই করার ক্ষমতা। যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার সাহস। এখন সমস্ত ভারতীয় র একসঙ্গে যুদ্ধ হলো দেশ কে করোনা মুক্ত করে রূপ নারণের কূল থেকে ফি রিয়ে আনা। আজ কবির ১৬০ তম জন্মদিনে আসুন, সমস্ত দ্বন্দ্ব ভুলে আজ সমস্ত ভারতীয় একসঙ্গে সংকল্প করি আমাদের দেশ কে করোনা মুক্ত করার। তবে ভারত আস্তে আস্তে হয়ে উঠবে সেই স্বর্গ, কবির ভাষায় - ' চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'।।

ঋত্বিকা মণ্ডল (সেমিস্টার, ২য়)

দুই বিঘা জমি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দুই বিঘা জমি " কবিতাটি একটি কাহিনী মূলক কবিতা। কবিতাটিতে কবি এক হতদরিদ্র চাষির কথা বলেছেন যার মাত্র দুই বিঘা জমি রয়েছে। সে ভাবে এটি তার মরিবার মতো ঠাঁই। কবিতায় কবি আরও এক চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি এক স্বৈরাচারী রাজা। দরিদ্র উপেনের দুই বিঘা জমিতে তার সাত পুরুষ বসবাস করে আসছে। তাই তার কাছে জমিটি ছিল লক্ষ্মীর মতো। রাজা জমিটি কিনতে চাইলে সে অস্বীকার করে এবং পরে তা রাজা ছিনিয়ে নেয় তার ক্ষমতার দ্বারা। সবশেষে আমরা দেখি যে কেবল দুটি আমের জন্য তাকে চোর অপবাদও দেওয়া হয়েছে কিন্তু গাছটি ছিল উপেনের। এই কবিতা থেকে একটা কথা বলা যায় যে জোর যার মুল্লুক তার, সমাজে যার ক্ষমতা বেশি সেই রাজত্ব করবে।।

সামিম হোসেন মীর (সেমিস্টার , ২য়)

একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে

' জীবন '

বাক্যটিতে ব্যবহৃত হয় তিনটি শব্দ, এই তিন শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে মানব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ,চাওয়া- পাওয়া, সুখ- দুঃখ। এ জীবনে চলার পথে বহু বাধা আসবে, সেগুলিকে উপেক্ষা করে পিছু না হোটে আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে হবে, তা সে হোক না একা । সমাজে কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ যারা সবকিছু জেনেও মুখ ফিরায়ে রয়। তাই আমরা নিজের মনের, কথা নিজের মনের ভাব, নিজের কাছেই বলতে বাধ্য আমরা। তাই, এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করো তা সে হোক না একা।

সোমনাথ মিস্ত্রী (সেমিস্টার, ৪র্থ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি এবং প্রাসঙ্গিকতা

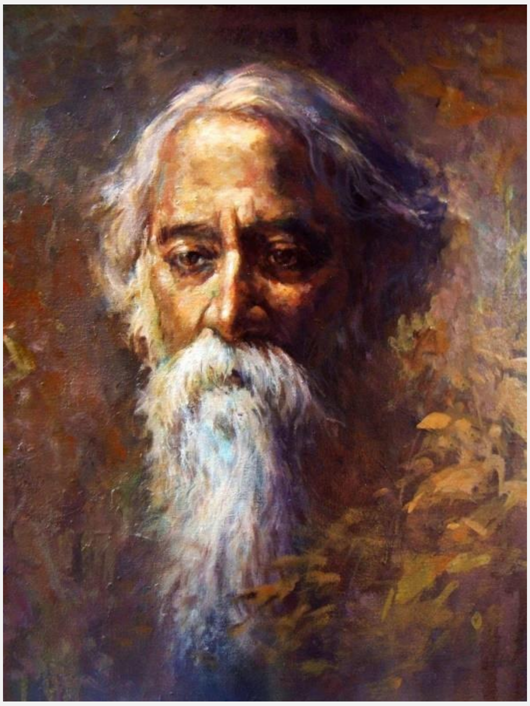

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি মানসিকতা ছিল বিশ্বমাত্রিক। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবির মন গভীরভাবে সংবেদনশীল হয়ে উঠতো। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী হানাহানির

তীব্র নিন্দা পোষণ করেছিলেন তার সমস্ত কবিতাতে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে তাই কবি তার কলমে রক্তিম অক্ষরে 'আফ্রিকা' কবিতাটি তে প্রকাশ করেছিলেন। কবিতাটিতে কবি কিছু সভ্য মানুষের বর্বর লোভ ও নির্লজ্জ তাকে প্রকাশ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের হিংসা ও অত্যাচারের প্রভাবে ধ্বংস হয়েছিল আফ্রিকা মানুষের জীবনযাত্রা। ওর সাথে সাম্প্রতিকালে কিছু রাজনৈতিক নেতা ক্ষমতা পাওয়ার লোভ,লালসায় মরণব্যাধি রোগ কে অবজ্ঞা করে মিছিল, সমাবেশ ও পিকেটিং ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের সংকীর্ণ মানসিকতাকে উন্মোচন করেছে, যার ফলস্বরুপ আফ্রিকা মানুষের মত ভারতের মানুষজনকে প্রতিনিয়ত স্বজন হারানোর কান্নায় ভেসে যেতে হচ্ছে। আফ্রিকার মতো আমাদের দেশেও মৃত্যুর মিছিলে বেরিয়ে পড়েছে,কিছু অমানবিকতা ব্যক্তির বর্বর লোভ, লালসার কারণে সেইদিনও যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আফ্রিকা' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ফলে মানব জাতি ধ্বংসের মুখে পড়েছিল ,তেমনি বর্তমানে রাজনৈতিক নেতাদের লোভের কারণে আজ মানবজাতি অবলুপ্তির পথে। এরপরও বলাই বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা যুগ যুগ ধরে সমাজের অপরিবর্তনশীল প্রাসঙ্গিকতাকে অক্ষুন্ন রেখে যাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা হল মানুষ এবং সমাজের প্রতিচ্ছবি।

সৌমিত্র মন্ডল (সেমিস্টার , ৪র্থ)

বলাই

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহার । রবীন্দ্রনাথের বলাই ছোট গল্পে এমনই ইতিহাসের মনস্তত্ত্বের সুক্ষতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।

ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস , নড়ে চড়ে বেড়ানো নয় । পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায় , ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ - অরণ্যের গন্ধ নিয়ে গনিয়ে ওঠে ; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে , ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ । ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে , গা খুলে বেড়ায় ; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয় । মাঘের শেষে আমের রোল। ধরে , তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে , একটা কাসের অব্যক্ত স্মৃতিতে ; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর - প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে , ভরে ওঠে , তাতে একটা ঘন রং লাগে । এখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে , যা - কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে । অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো পাখি , ব্যাঙ্গামা - ব্যাঙ্গামি , তাদের গল্প । ওই ভ্যাবা-ভ্যাবা চোখ - মেলে - সর্বদা তাকিয়ে - থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না । তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয় । ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে অমিল) ।

পাড়ে , ও কিছু বলতে পারে না , সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় । এর সীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে । দু - পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে , ফস্ করে বকুলগাছের তুলি । একটি ভেঙে নেয় — ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে । ওর সবচেয়ে বিপদের দিন , যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে । কেননা , ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে — এতটুকু - টুকু লতা , বেগনি হলদে নামহারা ফুল , অতি ছোটো ছোটো মাঝে মাঝে কন্টিকারি গাছ , তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোটা ; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও - বা কালমেঘের লতা , কোথাও - বা অনন্তমূল ; পাখিতে - খাওয়া নিমফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে , কী সুন্দর তার পাতা — সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়ানি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয় । তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয় , তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই । গল্পে লেখক একজন শিশুর সরলতা , তার অনন্য চিন্তা শক্তি ও বিশেষত তার প্রকৃতির প্রতি বিশেষ টান । তার সাথে তার কাকা অর্থাৎ লেখকের দ্বন্দ্ব তার কাকিমার সঙ্গে সুমিষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এই বিষয়গুলি দেখানোর মাধ্যমে পাঠকদের প্রতি এই বার্তা দিলেন যে একটি ছোট শিশুর ভালো মন্দ , ও তার ইছাগুলিকে কিভাবে বড়োরা এড়িয়ে যায় , তাদের ওপর নিজের ইচ্ছা গুলিকে চাপিয়ে দেয় এই বলে বা ভেবে যে সে ছোট তার ঠিক বা ভুল বিচার করার ক্ষমতা নেই ।একটি শিশু যে প্রকৃতিকে যেমন খুবই সহজে বুঝতে পারে, তেমনি তাকে ভালো লাগা ও ভালোবাসা এবং তার গুরুত্ব বিচার করতে পারছে, কিন্তু সেখানে আবার বড়োদের প্রকৃতির প্রতি উদাসীন ভাব লক্ষ্য করা যায় , তারা শুধুমাত্র তাদের ইচ্ছা আর সুবিধাগুলো কে ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চায় না, তা গল্পের শেষে প্রমাণিত হইছে। এই গল্পে লেখক গল্পের মূল চরিত্র বলাই এর প্রতি তার কাকিমার স্নেহ , ভালোবাসা , আবেগ ও চিন্তা প্রভৃতি তাকে কাকিমা থেকে মায়ের পদে উন্নীত করেছে যার মাধ্যমে লেখক এটাই জানান দিলেন যে একজন প্রকৃত মায়ের কাছে সকল ছেলেমেয়ে তার সন্তান হয় এবং পৃথিবীতে মা-রাই একমাত্র সন্তানদের দুঃখ , কষ্ট অনুভব করতে পারেন ।

বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা - বড়োরা অনেকসময় শিশুদের কে কথাকে গুরুত্ব দি না, কারণ তারা ছোট । এই কঠোর বাস্তবটি লেখক গল্পে প্রকটভাবে তুলে ধরেছেন । কিন্তু ভুলে গেলে হবে না যে তারাই ভবিষ্যতের দ্বীপ , এরাই আমাদের পরবর্তী সময়ে সমাজের অন্ধকারকে দুর করে আলোকিত সমাজ পরিচালনা করবে ।

এটা ঠিক যে আমাদের বাস্তব পৃথিবীর ঘটনা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা কম , কিন্তু দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে যেখানে বড়রা ভুল ও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না সেখানে তারাই সঠিক রাস্তা দেখিয়েছে । প্রকৃতি থেকেই যে মানুষের উৎপত্তি, তা মানুষ এই যন্ত্র সভ্যতার যুগে ভুলেই গেছে । আমরা আজ নিজেদের সুবিধা , স্বাচ্ছন্দ্যর জন্য নির্বিচারে গাছ কাটছি আর প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি , যা পরবর্তীকালে মানবজাতির অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে । তাই আজই আমাদেরকে সচেতন হয়ে পরিবেশকে সামগ্রিক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে একে সংরক্ষণ করতে হবে , এই গল্পের মধ্যে তার সংকেত পাওয়া যায়। বর্তমানে পারিবারিক ব্যাবস্থা ও সম্পর্ক অবনতির মুখে । বর্তমান বিশ্বায়ন এর যুগে সম্পর্কের চেয়ে স্বার্থ বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে । মানবিকতার কোনো মূল্য নেই এখনকার শিক্ষিত সমাজে ছোট ছোট স্বার্থের জন্য আপনও

পর হয়ে যায় । বেশিরভাগ সময় আমাদের কাছে ওপরের কথা গুরুত্ব পায় না বললেই চলে। উক্ত গল্পটি আমাদের শেখায় যে সম্পর্ক , মূল্যবোধ আপনের প্রতি মনের টান , ভালোবাসা ইত্যাদির আগে স্বার্থ , সংকীর্ণতা ও একক ইচ্ছার পরাজয় হইছে , যা আজকের সমাজকে সঠিকপথে নিয়ে যাবে । আর এখানেই এই গল্পের সার্থকতা।

শুভাশিষ দাস (সেমিস্টার , ৬ষ্ঠ)

আফ্রিকা

স্রষ্টা উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে

যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে

নতুন সৃষ্টিকে বারবার করেছিলেন বিদ্ধস্ত, তাঁর সেই অধৈর্য্য ঘন - ঘন মাথা নাড়ার দিনে

রুদ্র সমুদ্রের বহু

প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে

ছিনিয়ে নিয়ে গেলো তোমাকে , আফ্রিকা -

বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়

কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে ।

' আফ্রিকা ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' পত্রপুট ' কাব্যগ্রন্থের ষোল সংখ্যক কবিতা। কবিতাটির রচনাকাল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি । বিশ্ব স্রষ্টা যখন ধরিত্রী সৃষ্টিতে ব্যাস্ত ছিলেন তখন সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর সেই অসন্তোষের মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশের জন্ম । প্রাচ্যের ধরিত্রীর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পৃথক মহাদেশ রূপে আফ্রিকার উদ্ভব । স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বড়োই খুঁতখুঁতে - নিখুঁত রূপে গড়ে তুলতে চান তার আফ্রিকাকে । আফ্রিকা মহাদেশ পরিবেষ্টিত হলো বনস্পতির নিবিড় আচ্ছাদনে , ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশের অধিকার পায় না সেখানে । আফ্রিকার অন্তঃপুর তাই কৃপণ আলোয় মৃদু আলোকিত । অরণ্য ছায়ায় আবৃতা আফ্রিকার মানবিক রুপ সকলের কাছে অজ্ঞাত ছিল । আফ্রিকার মধ্যে যে থাকতে পারে মানবতা , কোমল অনুভূতি, স্নেহ - প্রেম তা সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা অস্বীকার করেছে । আফ্রিকাকে তারা মনে করেছে লুঠ - সন্ত্রাসের উন্মুক্ত ক্ষেত্র । শক্তিধর জাতি আফ্রিকাকে উপেক্ষা করেছে । আফ্রিকার মানুষদের তারা ক্রীতদাসে পরিণত করেছে । দস্যুর কাঁটা মারা জুতোর তলায় পদদলিত হয়েছে আফ্রিকার মানবতা , তার সভ্যতা । দস্যুর পদচিহ্ন কলঙ্কিত হয়েছে সভ্যতার ইতিহাস । চারিদিকে হিংস্রতার মাঝে কবির বাণী ই হবে সভ্যতার অন্তিম পুণ্যবানী - যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার অন্তিম কাল ঘোষিত হবে । তারই নান্দনিক শিল্পিত রুপ 'আফ্রিকা' কবিতা ।

সুদীপ মন্ডল (সেমিস্টার , ২য়)

<u>সভ্যতার প্রতি</u>

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্তমান নগর সভ্যতার কাছে লোহা কাঠ এবং পাথর দিয়ে তৈরি সমাজকে হরণ করে আদি অরণ্য আবৃত সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়ার করুন মিনতি জানিয়েছেন ।সর্বগ্রাসী বর্তমান সমাজের কাছে চেয়েছেন ছায়াবৃত তপবন ,আনন্দময় দিন ,শান্ত এবং পবিত্র সন্ধ্যা এবং হৃদয়ে নিত্য আলোচিত মহান ব্যক্তিদের মহান তত্ত্বগুলিকে। খাঁচায় বন্দী থাকাকালীন রাজভোগ খাবার তিনি পরিত্যাগ করে চেয়েছেন স্বাধীনতা এবং আপন হৃদয়ের শক্তি। তার আকুল হৃদয় সকল বন্ধন ছিন্ন করে অনন্ত এ জগতের হৃদয় কম্পিত ধ্বনি আস্বাদন করতে চায়।

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবারধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব--
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরানে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।

সুমন মন্ডল (সেমিস্টার ,৪র্থ)

ছবি ও কবি ৩

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,বাঙালি তথা সারা বিশ্বের কাছে এ এমন একটি নাম যা সারাজীবন মানুষের মণিকোঠায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকবে।এই মহান ব্যাক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল ১৮১৬ খ্রি ৭ই মে বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর এক অভিজাত ব্রাক্ষণ (ঠাকুর) পরিবারে।উনিশ শতকের সাহিত্য - সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিলো এই ঠাকুর পরিবার। তার পিতার ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যচেতনা থেকে জীবনদর্শন বহু যুগ ধরে বাঙালির জীবনকে প্রভাবিত করে

আসছে।কার্যত এমন কিছু বাঙালির জীবনে নেই,যা রবি ঠাকুরের সাহিত্য দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তাঁর বহু গুণমুগ্ধই বলে থাকেন,এক বিশাল মহীরুহ বিশ্বকবি।যে গাছের ডালপালা মূল কাণ্ড থেকে যতই বিস্তৃত হয়েছে ততই ছায়া দিয়েছে মানব চেতনাকে।সাহিত্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় সমৃদ্ধ করেছে বাঙালির সংস্কৃতিকে।রবি ঠাকুরের প্রতিটি তুলির টানে এক অসাধারণ চিন্তা ভাবনা প্রস্ফুটিত হয়েছে।যা প্রকৃতিকে এক অপূর্ব রূপ দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা উক্ত আঁকা ছবিতে আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং নারী প্রতিমূর্তি ফুটে উঠেছে তাই ছবিটিতে প্রকৃতি মা কে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের অভাবে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটছে তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে বাঁচানোর জন্য এক পা এগিয়ে আসুন আপনারা প্রকৃতিকে ভালোবাসুন এই প্রকৃতি আপনাকে সুন্দর ও সুস্থ জীবন উপহার দেবে। মৃত্যুর সাত দিন আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল ছিলেন।দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৪১ সালে জোড়াসাঁকোর বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ই আগষ্ট বিশ্বকবি মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা , জোড়াসাঁকোয় মহাপ্রয়াণে যাত্রা করেন । ২৫ শে বৈশাখের সূর্য (রবি) ২২ শে শ্রাবণের সন্ধ্যায় অস্ত যায়।

সহেলী ভাণ্ডারী (সেমিস্টার , ২য়)

অতিমারি যখন রবীন্দ্রভবনে

"ক্ষুদ্র দুঃখ সবে ভুলে যদি তাকাও দেখবে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"

এই লাইনটা বুঝি রবীঠাকুর এই সময়ের জন্যই লিখেছেন।বাঙালির আবেগ কবিগুরুর ১৬০তম জন্মবার্ষিকী অতিমারীর আবহে, সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই আবেগ একটু হলেও ফিকে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অতিমারি যে রবীন্দ্র সময় ছিল না তা নয়, স্বয়ং কবিগুরু মহামারী কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। নিজের বহু প্রিয় জনকেও হারিয়েছেন। সেই কাহিনী কারো অজানা নয়।

সালটা ১৯১১ প্লেগ, কালাজ্বর, কলেরার অতিমারির সময়। কলকাতার প্রতিটি গলিতে এর প্রকোপ পৌঁছে গেছে। বাদ যায়নি জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িটিও। চিকিৎসার সুযোগ নেই, কোন টীকা নেই, আছে শুধু মৃত্যুর ভয়ানক লীলাখেলা। অতিমারির কাছে জাতপাত, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী-মূর্খর বিভেদ নেই। জোড়াসাঁকোতেও মারণ রোগ বাসা নিয়েছে। মারা গেলেন দুই পরিচায়ক। মর্মাহত কবিগুরু নিজেই জড়িয়ে পড়লেন অতিমারিকে রুখে দেওয়ার প্রয়াসে। সঙ্গী হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতাও। পর্যবেক্ষণ, চিকিৎসা উদ্ধারকার্য চালাতে থাকলেও শেষরক্ষা হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০ বছরের মেয়েও বলি হয় অতিমারিতে। গোটা ঠাকুর পরিবার অতিমারিকে মর্মে অনুভব করেছে।

আজও ওই মারণ দিন গোটা দেশকে শাসন করছে অদৃশ্য ‘রাজা’ । আমরা কবিগুরুর আদর্শকে মাথায় রেখে পথ চলব, লড়বো, “বাঁচবো ও বাঁচাবো” ।

রাসিদা মন্ডল (সেমিস্টার, ৪)

রবির তিন কন্যা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বহুবিদ স্রষ্টা।সাহিত্যের নানান ক্ষেত্রে ছিল তার অগাধ বিচরণ। তিনি বাঙালির আত্মার সাথে নিবিষ্ট হয়ে আছেন।তাঁর সৃষ্টিগুলি সর্বকালে যেমন প্রাসঙ্গিক ,তেমনই আমাদের সকল অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উনিশ এর দশকে (বাংলা ১২৯৮–১৩১০)আমরা পাই তার ‘গল্প গুচ্ছ’,এটি বাঙালির কাছে ছোট গল্পের রত্ন ভাণ্ডার।যেখানে পেয়েছি বিচিত্র স্বাদের গল্প,যা সমাজের বৈচিত্র্যকে তুলে এনেছে আমাদের দৃশ্যপটে।আমার পছন্দের এই ‘গল্প গুচ্ছে’র তিনটি কন্যার চরিত্র,যাদের আমরা পাই ‘পোস্ট মাস্টার ‘গল্পের রতন,’মণিহারা’ র মণিমালিকা ও ‘সমাপ্তি’গল্পের মৃন্ময়ী।রবীন্দ্রনাথ চিরকাল নারীকে বিশেষ ভাবে স্থান দিয়েছেন নিজের লেখায়,এই তিনটি চরিত্র ও সেই রূপে বাস্তবমুখী হয়ে উঠেছে।সেগুলি বর্তমান সময়ের জন্য বড়ই প্রাসঙ্গিক। আমি নিজে একজন নারী হয়ে যা উপলব্ধি করতে পারি।তাঁর গল্পের ছোট্ট মেয়ে রতন যেমন শান্ত,গৃহকর্মে নিপুণ,আবার সে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হলেও শিখতে আগ্রহী।সে পড়তে ভালোবাসে,তাই মাস্টারমশাইকে পেয়ে নতুন পথের সন্ধান পায়।মাস্টার মশাই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হলে ছোট্ট মেয়েটির সেবা তাকে সুস্থ

করে তোলে।এখানে নারীর সেবাধর্ম ফুটে ওঠে,সে এখানে মমতাময়ী।মাস্টার মশাইয়ের গ্রাম ছাড়ার খবর তার কাছে হৃদয় বিদারক কারণ শিক্ষার আলো যে সে আবার হারিয়ে ফেলবে!

অন্য দিকে মণিমালিকা রত্ন অলংকারের প্রতি আসক্ত, তার স্বামীর আর্থিক উত্তরণ বা অবতরণ কিছুই তার উপর প্রভাব ফেলে না।সে কেবল তার গহনা হারানোর আশঙ্কায় ভীত হয়।কোন অবস্থাতেই সে কারোর সাথে তা ভাগ করতে চায় না।স্বামীর ভালোবাসার উপলব্ধি তার নেই,নির্বুদ্ধিতায় সে গৃহ ত্যাগ করে এবং তাকে প্রাণ হারাতে হয়।এখানে লেখক নারীর এক ঋণাত্মক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

শেষ গল্পের কন্যার চরিত্র মৃন্ময়ী।সে প্রাণোচ্ছল, হাসিখুশি এক মেয়ে,যার ভিতর রয়েছে কিছু সরল দুষ্টুমি।প্রকৃতির মত সে উচ্ছ্বল,মুক্ত। তাকে কোন গন্ডির ভিতরে আবদ্ধ করে রাখা যায় না।গন্ডির ভিতর সে প্রাণ খুলে বেঁচে থাকতে পারে না।তাই তাকে স্বামীর গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।কিন্তু সম্পর্কের মায়াজাল থেকে সে বের হতে পারে না,আবদ্ধ হতে হয় তাকে ভালোবাসার সংসারে।

বর্তমান সময়েও আমরা খুঁজে পাই এরূপ নারী চরিত্র ,যেখানে কেউ গৃহকর্মে নিপুণ, কেউ সেবাধর্মে দীক্ষিত ,কেউ জ্ঞান পিপাসু ,কেউ সজ্জা প্রিয়,গহনা প্রিয়।কারুর শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা থাকলেও তাকে লেখাপড়া ত্যাগ করে সাংসারিক বন্ধনে বাঁধা পড়তে হয়,আবার কেউ শিক্ষার কোন সুযোগই পায় না।অন্যদিকে কখনও নারী প্রকৃতির মত সহজ,সরল,উচ্ছ্বল, সমাজের নিয়মের বিরূপ। আবার কখনও সেই নারীই ভালোবাসায় আবদ্ধ। নারীর বিচিত্র রূপ লেখক তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে অপূর্ব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। এখানেই বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর লেখা আজও কতটা প্রাসঙ্গিক। তিনি বিরাজ করেন আমাদের মনের আনাচে কানাচে।আমরা তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যেই খুঁজে পাই আমাদের সব ছোট বড় অনুভূতিগুলিকে।

সত্যজিৎ রায়ের ‘তিন কন্যা’ চলচ্চিত্র টি রবি ঠাকুরের এই তিনটি গল্প অবলম্বনে ১৯৬১সালে প্রকাশ পায়।সেখানেও তিনি অপরিবর্তনীয় রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে।সুতরাং বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ কেবল সেই কাল নয়,এই কালে ও পরবর্তীকালে একই

রকম ভাবে প্রকট রূপেই ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।

পূজারিণী ঘোষ,
শিক্ষিকা,ভূগোল বিভাগ

মুক্তি

আমারে সাহস দাও ,দাও শক্তি ,হে চিরসুন্দর,
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ ,দাও মুক্তি নিরন্তর
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতনপীড়া হতে,
দিয়ো না দুলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে,
ক্ষোভের বিক্ষেপবেগে। শ্রাবণসন্ধ্যার পুষ্পবনে
গ্লানিহীন যে সাহস সুকুমার যূথীর জীবনে--
নির্মম বর্ষণঘাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর,
মুহূর্তের প্রাণটিতে ভরি তোলে অনন্তের সুর,
সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণশয্যা' পরে,
পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার বিনম্র অন্তরে
সুগন্ধে রচিয়া তোলে ;দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি ,অব্যাকুল,সহজে স্ববশ
আপনার সুন্দর সীমায় --,দ্বিধাশূন্য সরলতা
গাঁথুক শান্তির ছন্দে সব চিন্তা ,মোর সব কথা।

সারা বিশ্বের অতিমারীর আবহে ওনার সৃষ্টি হয়ে উঠেছে আরো প্রাসঙ্গিক।মুক্তি কবিতা অবলম্বনে আমরা যে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবেলার একটি ভাবধারা সৃষ্টি করে আমাদের এইপরিস্থিতিতে নিজেদের সাহস,শক্তি,ভরসা রাখা দরকার।আমরা এই পরিস্থিতি থেকে একটি সময়ের পর মুক্তি পাব যেখানে আমরা খোলা বাতাসে স্বাদ নিতে পারব,যেখানে আর থাকবে না কোন বাধা,যেখানে থাকবে না কোন ক্ষোভ, যেখানে আমরা পরিবেশে সুন্দর মহিমায় মুগ্ধ হতে পারব,আমরা আবার ও মুক্ত হব।

দিব্যেন্দু সাহা (সেমিস্টার , ২য়)

<u>রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি – প্রসঙ্গ শিক্ষা</u>

১৯৩০ এর সময়কাল – সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছলেন রাশিয়াতে। ওনার

রাশিয়ার চিঠিতে প্রানবন্ত হয়ে উঠেছে সেখানকার দেশ-কাল-সমাজ। একই সাথে

দেশটির সার্বিক বিকাশ তাকে মুগ্ধ করেছিল। এই ভ্রমন প্রেক্ষিতে তিনি তুলনা করেছিলেন তৎকালীন ভারত দেশ এবং রাশিয়ার।

ভৌগোলিক ভাবে রাশিয়ার বিস্তৃতি পৃথিবীর ছয়ভাগের প্রায় এক ভাগ। এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘিরে রয়েছে এই দেশকে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন এই দেশের ভুগোলের বিস্তৃতি যেমন বড় মাপের তারজন্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনেক বৈচিত্র্যময় । উনি রাশিয়ায় এসে এই বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেচিলেন। ওনার রাশিয়ার চিঠি তাই এক ঐতিহাসিক দলিল। যেখানে প্রাকৃতিক ভূ-দ্রশ্যকে ব্যাতিরেকে সামাজিক-রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক ভূ-দ্রশ্য হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক দলিল।

রবীন্দ্রনাথ দেশে তাহক্তেই আগ্রহী ছিলেন বহির্বিশ্ব কিভাবে নিজেদের গড়ে তুলছে উন্নতি সাধনের জন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় যে সমস্ত দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল রাশিয়া। লেনিন সহ কম্যুনিস্ট পার্টির কমরেড দের হাত ধরে রাজতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে দ্রুত বদলের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ কে অবাক করেছিল। তিনি রাশিয়ায় এসে তাই বারে বারে দেখতে চাইছিলেন সেই সব মানুষ দের যারা অতীত মুছে দিয়ে এক নতুন বিশ্ব গড়ে তোলায় নিজেদের নিবেদন করেছে।

তিনি লিখছেন – ‘ এখানে এসে দেখলুম এরা শিক্ষাটাকে প্রানবান করে তুলেছে। তার কারন এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখেনি। এয়ারা পাস করবার কিংবা পন্ডিত করবার জন্যে শেখায় না – সর্বতো ভাবে মানুষ করবার জন্য শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো , পুঁথির পঙ্‌ক্তির বোঝার ভারে চিন্তাকে চালনা করার ক্ষমতা আমাদের থাকে না।’

উনি আগ্রহী ছিলেন রাশিয়ার শিক্ষাপ্রনালীর বিভিন্ন বিষয় দেখবার জন্য। কোন জায়গার উনি লিখছেন – ‘ শিক্ষাবিধি সমন্ধে রিপোর্ট এবং বই পড়ে অনেকটা জানা যেতে পারে কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেটাই সবচেয়ে বড় কাজের। ’

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এই শিক্ষাকে বুঝতে ছেয়েছিলেন। মস্কোতে এক কম্যুনে এ উনি গেছিলেন এই শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ করতে। উনি লিখছেন – ' বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দুধারে বালক বালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আসতেই ওরা আমার চারিদিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। ' এই সহজ অন্তরঙ্গ ব্যাবহার শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ । রবীন্দ্রনাথ তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারলেন তাদের শিক্ষা শুধু পুঁথিগত নয়। সেই শিক্ষাকে প্রয়োগিক করে তুলতে বিভিন্ন পথ নেওয়া হয়। তিনি লিখছেন – 'একটি ছেলে বললে, প্রথমে আমরা বই থেকে শিক্ষকের কাছ থেকে শিখি, তারপরে তাই নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তার পরে সেই গুলি সাধারন কে জানাবার জন্য যাবার হুকুম হয়। '

রাশিয়ার চিঠির বিভিন্ন অংশে ওনার এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরন খুঁজে পাওয়া যায় । অবাক হয়ে তিনি দেখছেন একটা দেশ পন করেছে কিভাবে শিক্ষাকে হাতিয়ার করে দেশকে সর্ব শক্তি তে সুদক্ষ করে তুলবে । ধনী কে ধনীতর করা নয় – জনসমষ্টি কে পরিনত করা র এ যেন এক মহাযজ্ঞ । রাশিয়ার চিঠি তাই আমাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধীয় এক শিক্ষণীয় দলিল ।

ব্রততী দে

শিক্ষিকা, ভূগোল বিভাগ

নব আনন্দে জাগো আজি

নবরবিকিরণে

শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল

নির্মল জীবনে ||

ধ্রুব চাঁদ হালদার কলেজ

ভূগোল বিভাগ

দক্ষিন বারাশত, দক্ষিন ২৪ পরগণা